কোয়ান্টাম মেথড-১৩

অমুসলিমদের প্রতি উদারতা

মুফতী শরীফুল আ'জম

শূন্য কোঠার জ্ঞান নিয়ে বর্তমান সময়ে যে বিষয় নিয়ে উদ্দম আলোচনায় মত্ত হওয়া যায় তা হচ্ছে ইসলাম। ধর্মের প্রতি উদাসীনতার একটি কুফল এটি। যে যার মতো ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে ধার্মিক পরিচয় দিচ্ছে। নিজস্ব ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ধর্ম পালন মহামারী আকার ধারণ করেছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে কেহ ধর্মের বিধিবিধানে কাটছাঁট করে মডার্ন বানাচ্ছে। আবার কেহ ইসলামের স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন করে সকল ধর্মের সাথে একে গুলিয়ে ফেলছে। জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত মানুষের মুখে 'ধর্মের কোনো বাড়াবাড়ি নেই', 'অন্যের দেবতাকে গালি দিওনা' বা 'ধর্ম যার যার' ইত্যাদি বুলির খৈ ফুটতে দেখা যায়। মূলত পবিত্র কুরআনের কতক আয়াতের সঠিক তাফসীর না জানাতে এই ভুলের সূত্রপাত। সমাজের এহেন হ-য-ব-র-ল অবস্থার মাঝে কোয়ান্টাম মেথড ঢিল ছুঁড়তে ভুল করেনি। ইসলামের উদারতার অপব্যাখ্যা করতে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত বিকৃতরূপে উল্লেখ করেছে কোয়ান্টাম কণিকায়। কোয়ান্টাম তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে হক্ব-বাতিলে তফাত মিটিয়ে দিয়েছে। ইসলামের উদারতার দোহাই দিয়ে সকল ধর্মকে সত্যধর্ম ইসলামের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। বস্তুত ইসলাম ভিন ধর্মের প্রতি উদার ঠিক তবে সেই উদারতার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও সীমারেখা রয়েছে। আজকের আলোচনায় বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

ঈমান-আমলের ব্যাপারে উদারতা নয় : উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু এই উদারতা মানবিক অধিকার ও ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়ে থাকে। ঈমান-আক্বীদা বা আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার উদারতার অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে হক্ব বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চাই। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর তাঁর রাসূলের ওপর এবং তাদের কারো প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আন নিসা ১৫০-১৫২)

এখানে ঈমানদার ও বেঈমানের পরিণতি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কুফরে অটল থেকে কেহ পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। সেথায় সফলতা আর সুখ-শান্তি একমাত্র ঈমানদারের প্রাপ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ঈমান-আমলের প্রশ্নে উদারতার কোনো স্থান নেই। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'আরিফুল কুরআনে উক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলা হয়েছে- কুরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা "ওইসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্ম মত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফায়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদের বোঝাতে চায় যে, মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত; কোনো কোনো পয়গাম্বরকে অমান্য করে। ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামি হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজিরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যেকোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনাধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরম সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম

অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র বজায় রাখলে চলবে না বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যেকোনো ধর্ম মতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও কুরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা)

পরীক্ষকের উদারতা :

অমুসলমানদের প্রতি ইসলামের উদারতাকে পরীক্ষকের উদারতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার হলে ছাত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ভুল-সঠিক যাচ্ছেতাই সে লিখতে পারে। পরীক্ষক তার ভুল বুঝতে পারলেও লিখতে বাঁধা দেন না বরং উদারতার পরিচয় দিয়ে তিন ঘণ্টা সময় তাকে স্বাধীনভাবে লিখতে দেন, তবে এই উদারতা কিন্তু ভুলের স্বীকৃতি নয় নিছক পরীক্ষা মাত্র। খাতা দেখার সময় কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। তদ্রূপ অমুসলমানদের প্রতি ইসলাম যে উদারতার বিধান রেখেছে তা দুনিয়ার এ পরীক্ষার হলেই সীমাবদ্ধ। এখানে কুফর পালনের স্বাধীনতা দেয়া হলেও শেষ বিচারের দিন ছাড় দেয়া হবে না। ভুলের খেসারত তখন অবশ্যই দিতে হবে। তাই ইসলামের এই উদারতাকে কুফর-শিরকের স্বীকৃতি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে কুফর-শিরকের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে সতর্ক করা হয়েছে।

ধর্ম যার যার :

অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত ভাইদের মুখে সুরা কাফিরুনের একটি আয়াত–

لكم دينكم ولى دين

(লাকুম দ্বীনুকুম) এ ধরনের আলোচনায় জোরালোভাবে তুলে ধরতে দেখা যায়। এ আয়াত থেকে ধর্ম যার যার থিউরি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। আয়াতের সঠিক অনুবাদ ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকায় মূলত তাদের এ ভুলটির সূত্রপাত।

তাবারানী এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবেন। (মাযহারী)

আবু সালেহ এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরুন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ তা'আলার অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

ইরশাদ হচ্ছে- "বলুন, হে কাফেরকুল। আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত করো। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা করো। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। (সূরা কাফিরুন) অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

উক্ত সূরায় শেষ আয়াত–

لكم دينكم ولى دين

এর বিকৃত অনুবাদ ধর্ম যার যার মতবাদের উৎস। এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে دين (দ্বীন) শব্দটি এখানে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহায় مالك يوم الدين এর মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ প্রতিদান দিবসের অধিপতি। এখানে دين(দ্বীন) অর্থ ধর্ম নয়। অতএব তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম অনুবাদ করা ভুল। তাফসীর বিশারদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- لكم دينكم এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো- "যেমন কর্ম তেমন ফল।" (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

বোঝা গেল যে, মক্কার কাফেরদের পক্ষ

থেকে দেয়া শান্তি চুক্তির প্রস্তাবটি ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদের পরিপন্থী হওয়ায় কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইসলামের উদারতা আপন জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু ধর্মের মূলনীতির ব্যাপারে কোনো রূপ ছাড় নেই। কাজেই সূরা কাফিরুন এ ধরনের উদারসন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময় কাফেরদের সাথে সন্ধি বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু এসকল চুক্তির কোনো ধারাতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। বরং সর্বত্র ইসলামের বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে আর অন্য সকল ধর্মের অসারতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কিন্তু সকল ধর্মের স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয়া হয়নি। "ধর্ম যার যার" এ কথার শিক্ষা ইসলামে নেই, আছে "যেমন কর্ম তেমন ফল" এ কথার শিক্ষা। ঈমান-আমলের ফল জান্নাত আর কুফর-শিরকের ফল জাহান্নাম। ইরশাদ হচ্ছে- "যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা আন নাযিআত-৩৭-৪১)

পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ :

অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম যে উদারতার ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছে অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তা একান্তই বিরল। এ ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ সদ্ব্যবহার, সহানুভুতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে। দুই ব্যক্তির অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

১. একটি স্তর হলো, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে। অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়। (সূরা আলে ইমরান-২৮)

২. সমবেদনার স্তর, এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানদের সাথে স্থাপন করা জায়েয। (সুরা মুমতাহিনা-৮)

৩. সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে–

الاان تتقوا منهم تقة

বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানের ক্ষতি হয় তবে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অমুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে।

বন্ধুত্ব নিষিদ্ধের কারণ :

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কুরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোনো অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না হওয়ার রহস্য কী? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষও লতা-পাতার মতো নয় যে, জন্ম লাভ করবে, বড় হবে, এর পরে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমনকি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপার্শ্বে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষনই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই যখন মানব জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজকারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয় বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

من احب لله وابغض لله فقداستكمل الإيمان-

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।" এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির

সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহর অনুগত। এ কারণে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

কোয়ান্টামের উদারতাঃ

উদারতার ইসলাম নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে কোয়ান্টাম। 'যেমন কর্ম তেমন ফলে'র কথা প্রচারের পরিবর্তে 'ধর্ম যার যার' দর্শন প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর স্বপক্ষে তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অংশ বিশেষ বিকৃতরুপে উপস্থাপন করেছে। কোয়ান্টাম কণিকার ২৯৯ নং পৃষ্ঠায়।

১. তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।" (নিসা-২৭১)

২. "অন্যের দেবতাকে গালি দিও না।" (আনআম-১০৮)

৩. ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট।" (বাকারা-১৫৬)

ইসলামের কোনো বিধিবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ খণ্ডন করতে অথবা যার যার ধর্ম পালনের বৈধতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম এ আয়াত তিনটির অপপ্রয়োগ করে থাকে। অথচ বাস্তব পক্ষে এ সকল আয়াত ইহুদী-খ্রিস্টান আর কুফর-শিরকের প্রতি ধিক্কার আর তিরস্কার জ্ঞাপনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত তিনটি পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক প্রেক্ষাপটসহ পর্যালোচনা করলেই কোয়ান্টামের গোঁজামিল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক.

সুরা নিসার আয়াত খানির আংশিক বাদ দিয়ে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। পূর্ণ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রুহ তারই কাছ থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো, তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা-১৭১)

উক্ত আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রিস্টানগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে অতি ভক্তি করতে গিয়ে খোদার পুত্র সাব্যস্ত করেছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। উক্ত আয়াতে তাদের এই কুফর শিরকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এবং ত্রিত্ববাদের অসারতা তুলে ধরে একত্ববাদের আওয়াজ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আফসোস! কোয়ান্টাম এ আয়াত থেকেই উল্টা ইহুদী খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধর্মের বৈধতা দিতে চায়। কুফর-শিরকের প্রতি নীরব সমর্থন ও উদারতা প্রকাশ করতে চায়। মনে রাখতে হবে, যে কাজের যে সীমারেখা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা অতিক্রম করাই হচ্ছে বাড়াবাড়ি। সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই ধর্মে বাড়াবাড়ি হিসেবে গণ্য হবে। অতএব অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সীমারেখা লঙ্ঘন করে কোয়ান্টাম নিজেই বাড়াবাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে।

দুই.

কোয়ান্টাম কণিকায় বিকৃতরূপে উল্লেখিত সূরা আল আনআমের আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা অরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা দৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (সুরা আল আনআম-১০৮)

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট : ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযুল এই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা আবু তালেবকে বলল, আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার আপনি জানেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কাছে ডেকে বললেন, এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে

এসেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধি দলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কী চান? তারা বলল, আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আচ্ছা যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের অধিপতি হয়ে যাবেন। এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে।

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ কথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, ভ্রাতাপুত্র এ কালেমা ছাড়া অন্য কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কোনো কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন। এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল, হয় আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ওই সত্তাকেও আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়,

ولاتسبواالذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علم۔

অর্থাৎ, আপনি ওই প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে বরং কোনো জন্তুকে কখনো গালি দেননি। সম্ভবত কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর শব্দ বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

দেব-দেবীর স্বরূপ :

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআনের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনো কোনো বিষয়ের তথ্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকিমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না। তেমনি কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে- ضعف الطالب والمطلوب অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে- انكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয় পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কু-পরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব বোঝা গেল, উক্ত আয়াতে অন্যের দেবতাকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু এতে দেব-দেবীর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বা তাদের পূজা অর্চনাকে বৈধ করা হয়নি। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদের অসারতার কথা তুলে ধরে প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাহলে কোয়ান্টাম কেন? ইসলামের উদারতার

দোহাই দিয়ে সকল ধর্ম পালনের বৈধতা দিচ্ছে? দেব-দেবীর অসারতার কথা কুরআনে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোয়ান্টাম কেন সেটা তুলে ধরছে না? এ ধরনের গোঁজামিল উদারতা নয় বরং ধোঁকা প্রতারণার শামিল।

তিন.

কোয়ান্টাম সূরা বাকারার আয়াতটিও আংশিক উল্লেখ করেছে। পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে- "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহকে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা আল বাকারা-২৫৬) হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করব? হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন-لا اكراه فى الدين অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়।" তাই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিক কিন্তু এতে অন্য সব ধর্মের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। বরং ইসলামের রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই মুক্তি নিহিত থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তা বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। জোর করে গ্রহণ করানো যাবে না। আর স্বেচ্ছায় কেহ যদি ইসলামকে গ্রহণ না করে পরকালে শেষ বিচারে তার পরিণতি কী হবে তার ঘোষণা পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।" (সূরা আল বাকারাহ-২৫৭)

বোঝা গেল, ঈমান গ্রহণ না করার ফলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এটাই মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা। পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। কোয়ান্টাম ইসলামকে যেভাবে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে সেটা নিছক তাদের চাতুর্যতা ও মিথ্যাচার মাত্র। মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস আর অমুসলিমদের চিরস্থায়ী দোযখের বন্দোবস্ত করতেই তারা ইসলামের উদারতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ পাক মুসলিম-অমুসলিম সকলকে হেফাজত করুন। আমীন!!

পবিত্র রামাযানুল মোবারক উপলক্ষে
ইমাম, উলামা ও মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য

২৫ দিন ব্যাপী
আন্তর্জাতিক মানের
ক্বেরাত প্রশিক্ষণ
২০১৩

২৫ শা'বান থেকে
২০ রামাযান ১৪৩৪ হিজরী পর্যন্ত

স্থান : জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া
আশ্‌রাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা-১২১১।

ক্বেরাতের দারস্ দেবেন:
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (হারদুঈ রহ.) এর বিশিষ্ট খলিফা, ১০১টি কিতাবের লেখক
আল্লামা ক্বারী আবুল হাসান আ'জমী
দেওবন্দ, ভারত

সহযোগিতায় থাকবেন :
মাওলানা ক্বারী সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী
মাওলানা ক্বারী ছিদ্দিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

ভর্তি ফি : ১২০০ টাকা। জামিয়ার পক্ষ থেকে ফ্রি খানার ব্যবস্থা থাকবে।
থাকার বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্নদের সনদ দেয়া হবে

আরজগুযার : শাহ্ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মুহতামিম
যোগাযোগ: ৭৩২০০১১, ০১৮১৪৪৪২০১১, ০১৭১২-০৫২১৮৫

বি:দ্র: ২০ শা'বান হতে ২০ রামাযান পর্যন্ত নূরিয়া তালীমুল কোরআন বোর্ডের উদ্যোগে মুআ'ল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭৫২-৬৬৭৮২৩